بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৭ জুন, ২০১৯ মোতাবেক ০৭ এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ থেকে পুনরায় বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করব। আজ যে সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হবে তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক। আল্লামা যুহরী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক যাফরী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উরওয়া তার নাম আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক বালভী লিখেছেন, যিনি আনসারদের মিত্র ছিলেন। কারো কারো মতে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক বালভী আনসারদের বনু জাফর গোত্রের মিত্র ছিলেন। ইবনে হিশাম-এর মতে তিনি বালী' গোত্রের সদস্য ছিলেন এবং বনু আবদ বিন রেযা গোত্রের মিত্র ছিলেন। হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন, অর্থাৎ মায়ের দিক থেকে আপন ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এর মাতা বনু উযরা'র শাখা বনু কাহেল এর সদস্যা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এবং হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর রজী'র ঘটনার দিন উভয় ভাই শাহাদত বরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক সেই ছয় জন সাহাবী বা কোন কোন রেওয়ায়েতে যাদের মাঝে বুখারীর রেওয়ায়েতও রয়েছে তাদের সংখ্যা দশ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে মহানবী (সা.) তৃতীয় হিজরী সনের শেষের দিকে আযল এবং কারা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করেছিলেন, তাদেরকে ধর্ম শিখানো এবং পবিত্র কুরআন ও ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা প্রদান করার জন্য। তারা যখন রজী' নামক স্থানে পৌঁছেন, যা হুযায়েল গোত্রের মালিকানাধীন হেজায এর একটি ঝর্ণার নাম ছিল, তখন হুযায়েল গোত্রের লোকেরা ঔদ্ধত্ব বশত সেই সাহাবীদের ঘেরাও করে এবং বিদ্রোহ করে তাদের সাথে লড়াই এবং যুদ্ধ করে। তাদের মাঝে সাতজন সাহাবীর নাম নিম্নরূপ:

হযরত আসেম বিন সাবেত, হযরত মারসাদ বিন আবু মারসাদ, হযরত খুবায়েব বিন আদী, হযরত খালেদ বিন বুকায়ের, হযরত যায়েদ বিন দাসেনা, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এবং হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ। তাদের মাঝে হযরত মারসাদ, হযরত খালেদ, হযরত আসেম এবং হযরত মুআত্তেব বিন উবায়েদ সেখানেই শহীদ হয়ে যান। হযরত খুবায়েব এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক আর হযরত যায়েদ অস্ত্র সমর্পণ করলে কাফেররা তাদেরকে বন্দি করে এবং তাদের নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। তারা যখন যাহরান নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মক্কা থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক রশি থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেন এবং নিজের তরবারি হাতে নিয়ে নেন। এই অবস্থা দেখে মুশরেকরা তাদের কাছ থেকে পিছনে সরে যায় আর তার ওপর পাথর ছুড়তে থাকে যতক্ষণ না তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার কবর যাহরানেই অবস্থিত। রজী'-

র ঘটনা হিজরতের পর ৩৬তম মাসে সংঘটিত হয়, যা ছিল সফর মাস। হযরত হাস্‌সান তার কবিতায় এই সাহাবীদের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,

ওয়াবনুদ দাসেনা ওয়া ইবনু তারেকিন মিনহুম
ওয়া আফাউ সাম্মা হিমামুহুল মাকতুব

আর এই কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো-

সাল্লাল ইলাহু আলাল্লাযিনা আন তাতাবাউ
ইয়াওমুর রজীয়ে ফাউকরিমু ওয়া উসীবু

এই পঙ্‌ক্তিগুলোর অনুবাদ হলো- হযরত ইবনে দাসেনা আর হযরত ইবনে তারেক তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, মৃত্যু সেখানেই তাদের সাথে মিলিত হয়েছে যেখানে তা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর তার কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে তিনি বলেন, উপাস্য খোদা তাদের প্রতি কৃপা করেছেন যারা রজী'-র যুদ্ধের দিন একের পর এক শহীদ হয়েছেন। অতএব তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে এবং তাদের পুণ্যের ভাগী করা হয়েছে।

রজী'-র ঘটনা সম্পর্কে পূর্বেও কয়েকজন সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় আমি বর্ণনা করেছি, এখানেও কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত লিখেছেন, এর সারাংশ তুলে ধরছি। মহানবী (সা.) এর কাছে চতুর্দিক থেকে কাফেরদের হামলা এবং তাদের ষড়যন্ত্রের অত্যন্ত ভয়াবহ সংবাদ আসছিল। উহুদের যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে কাফেররা ধৃষ্ট এবং উদ্ধত হয়ে উঠছিল আর তাদের পক্ষ থেকে বিপদের অনেক বেশি আশঙ্কা ছিল। এ কারণে মহানবী (সা.) চতুর্থ হিজরী সনে ইসলামী বর্ষপঞ্জির সফর মাসে নিজের দশজন সাহাবীর একটি দল প্রস্তুত করেন এবং তাদের আমীর নিযুক্ত করেন হযরত আসেম বিন সাবেতকে। আর তাদেরকে সংগোপনে মক্কার নিকটে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে, তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে, তাদের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁকে (সা.) অবহিত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই দল রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই আযল ও কারা গোত্রের কিছু লোক তাঁর (সা.) কাছে উপস্থিত হয়ে বলে যে, আমাদের গোত্রসমূহে বহু লোক ইসলামের প্রতি আকর্ষণ রাখে। আপনি আমাদের সাথে কয়েকজনকে প্রেরণ করুন যারা আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করবে এবং ইসলামের শিক্ষা দিবে যেন আমরা মুসলমান হতে পারি। মহানবী (সা.) তাদের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে প্রেরণের জন্য যে দলটি প্রস্তুত করা হয়েছিল সেটিকে সেখানে প্রেরণের পরিবর্তে এদের সাথে প্রেরণ করেন। কিন্তু যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল আর বনু লেহইয়ান গোত্রের প্ররোচনায় তাদের কথায় মদীনায় এসেছিল যারা তাদের নেতা সুফিয়ান বিন খালেদ এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এই চালাকি করেছিল যে, এই অজুহাতে কতিপয় মুসলমান মদীনা থেকে বের হলে তাদের ওপর আক্রমণ করা হবে। আর বনু লেহইয়ান গোত্র এই কাজের জন্য বিনিময় হিসেবে আযল এবং কারা গোত্রের লোকদের জন্য বহু উট পুরস্কার হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছিল। আযল এবং কারা গোত্রের এই বিশ্বাস ঘাতক লোকেরা উসফান এবং মক্কার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে বনু লেহইয়ান গোত্রের কাছে গোপনে এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, মুসলমানরা আমাদের সাথে আসছে, তোমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য চলে আস। তখন বনু লেহইয়ান গোত্রের দুইশত যুবক, যাদের মাঝে একশত তিরন্দাজ ছিল, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বের হয়, অর্থাৎ তাদের ডাকার ফলে সেখানে চলে আসে এবং রজী' নামক স্থানে তারা মুখোমুখি হয়। মুসলমানরা

দশ জন ছিলেন, কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী সাতজন ছিলেন। এই গুটিকতক ব্যক্তির জন্য কাফেরদের দুইশত সৈন্যের মোকাবেলা করা কীভাবে সম্ভবপর যারা ছিল পুরোপুরি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু মুসলমানদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঈমানের উদ্দীপনা ছিল আর অস্ত্র সমর্পণ করা তাদের প্রকৃতিতে ছিল না। তারা তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার প্রস্তুতির জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিকটবর্তী একটি টিলায় আরোহন করেন। কাফেররা, যাদের কাছে প্রতারণা করা দোষের কিছু ছিল না, তাদেরকে ডেকে বলে যে, তোমরা পাহাড় থেকে নীচে নেমে আস, আমরা তোমাদের পাকা কথা দিচ্ছি যে, তোমাদের হত্যা করবো না। হযরত আসেম উত্তরে বলেন, তোমাদের প্রতিশ্রুতি এবং ওয়াদায় আমাদের কোন ভরসা নেই। আমরা তোমাদের এই কথায় নেমে আসতে পারি না। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত আসেম আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেন, হে খোদা! তুমি আমাদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, অতএব স্বীয় রসূলের কাছে আমাদের এই অবস্থার সংবাদ পৌঁছে দাও। যাহোক হযরত আসেম এবং তার সাথীরা মোকাবেলা করেন এবং অবশেষে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। যখন সাতজন সাহাবী নিহত হন আর শুধু খুবায়েব বিন আদী ও যায়েদ বিন দাসেনা এবং আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক অবশিষ্ট থাকেন তখন কাফেররা, যাদের প্রকৃত ইচ্ছা ছিল তাদেরকে জীবিত বন্দি করা, পুনরায় তাদেরকে ডেকে বলে, এখনও নীচে নেমে আস, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। এবার তারা (অর্থাৎ সাহাবীরা) তাদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে নেন আর তাদের ফাঁদে পা দিয়ে নীচে নেমে আসেন। কিন্তু নীচে নামতেই কাফেররা তাদের ধনুকের তন্ত্রী দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলে। এতে খুবায়েব, যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি। তারা চিৎকার করে বলেন, এটি তোমাদের প্রতারণা। দ্বিতীয়বার তোমরা আমাদের সাথে এমন করেছ আর জানি না পরবর্তীতে আরো কী করবে? আব্দুল্লাহ্ তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান, যার ফলে কাফেররা আব্দুল্লাহ্‌কে টেনেহিঁচড়ে এবং প্রহার করে কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, অতঃপর তাকে হত্যা করে সেখানেই ফেলে দেয়। এখানে আব্দুল্লাহ্ বলতে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেককে বুঝানো হয়েছে। এই বর্ণনায় লেখা আছে যে, তারা এভাবে তাকে নিয়ে যায় কিন্তু আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তার হাত মুক্ত করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তখন তারা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে শহীদ করে। যাহোক এই বর্ণনানুসারে তাঁকে শহীদ করা হয় এবং সেখানেই ফেলে দেয়া হয়। এখন যেহেতু তাদের প্রতিশোধ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল তাই কুরাইশদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এবং অর্থের প্রলোভনে তারা খুবায়েব ও যায়েদকে সাথে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছে তাদেরকে তারা কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেয়। হারেস বিন আমের বিন নওফেলের ছেলেরা খুবায়েবকে কিনে নেয়। কেননা বদরের যুদ্ধে খুবায়েব হারেসকে হত্যা করেছিলেন। আর যায়েদকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া ক্রয় করে নেয়। হযরত খুবায়েব (রা.) সম্পর্কেই এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বন্দি থাকা অবস্থায় একটি শিশু খেলতে খেলতে তার কাছে চলে আসে, এটি সেই কাফেরদের শিশু ছিল যার বাড়িতে তিনি ছিলেন, আর খুবায়েব তখন তাকে তার কোলে বসিয়ে নেন। এর ফলে তার মা খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে, তখন হযরত খুবায়েব তাকে বলেন, বিচলিত হবেন না, তাকে আমি কিছুই করব না। যদিও তখন তার হাতে ক্ষুর ছিল, আর এই ক্ষুর দেখেই সে ভয় পেয়েছিল। যাহোক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক এই রজী'-র ঘটনায় এভাবে শহীদ হয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি কাফেরদের সাথে এগিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং সেখানেই লড়াই করেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আকিল বিন বুকায়ের (রা.)। হযরত আকিল বিন বুকায়ের এর সম্পর্ক ছিল বনু সা'দ বিন লায়েস গোত্রের সাথে। হযরত আকেলের পূর্বের নাম ছিল গাফেল, কিন্তু তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার নাম রাখেন আকেল। ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক বেশীরভাগ পুস্তকে তার পিতার নাম বুকায়ের উল্লেখ হয়েছে তবে কতিপয় গ্রন্থে আবু বুকায়েরও লেখা আছে। তার পিতা বুকায়ের অজ্ঞতার যুগে হযরত উমরের এক পূর্বপুরুষ নুফায়েল বিন আব্দুল উয্যার মিত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে বুকায়ের এবং তার সকল সন্তান-সন্ততি বনু নুফায়েলের মিত্র ছিল। হযরত আকেল, হযরত আমের, হযরত ইয়াস এবং হযরত খালেদ (রা.) -এই চার ভাই বুকায়ের এর পুত্র ছিলেন। তারা সবাই একসাথে দ্বারে আরকামে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এরা সবাই ছিলেন দ্বারে আরকামে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। হযরত আকেল, হযরত খালেদ, হযরত আমের এবং হযরত ইয়াস (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের জন্য রওয়ানা হন তখন তারা নিজেদের নারী, পুরুষ, শিশু সবাইকে একত্র করে একসাথে হিজরত করেন। তাদের পরিবারের কোন সদস্য মক্কায় রয়ে যায় নি। এমনকি তাদের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরা সবাই মদিনায় হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আকেল এবং হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযেরের মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন অর্থাৎ তাদেরকে ভাই-ভাই বানিয়ে দেন। তারা দু'জনই বদরের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। এক বর্ণনানুসারে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আকেল এবং হযরত মুজায্যের বিন যিয়াদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত আকেল বদরের যুদ্ধের দিন ৩৪ বছর বয়সে শহীদ হয়েছিলেন। তাকে মালেক বিন যুহায়ের জোশমি শহীদ করেছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত ইয়াস এবং তার ভাই হযরত আকেল, হযরত খালেদ এবং হযরত আমের ছাড়া এমন আর কোন চার ভাইয়ের কথা আমার জানা নেই যারা একত্রে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

যায়েদ বিন আসলাম হতে বর্ণিত, আবু বুকায়েরের সন্তানরা মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, বেলাল সম্বন্ধে তোমাদের কী মত? অর্থাৎ তাদের চার ভাইয়ের মাঝে কয়েকজন বা সবাই বোনের বিয়ের জন্য মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) হযরত বেলালের সাথে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাদের মত জিজ্ঞেস করেন। তাদের মনঃপূত হয় নি বলে তারা তখন চলে যান। তারা দ্বিতীয়বার মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.) আবার বলেন, বেলাল সম্বন্ধে তোমাদের কী ধারণা? এটি শুনে তারা পুনরায় চলে যান। এরপর তৃতীয়বার তারা মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, অমুক ব্যক্তির সাথে আমাদের বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, বেলাল সম্বন্ধে তোমাদের কী মত? সেইসাথে তিনি (সা.) আরো বলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী মত যে জান্নাতের বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? এ কথা শুনে তারা হযরত বেলাল (রা.)-এর সাথে তাদের বোনের বিয়ে দেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত যায়েদ বিন হারেসা। হযরত যায়েদ (রা.)-এর পিতার নাম হারেসা বিন শারাহীল ছাড়া হারেসা বিন শোরাহবীলও বর্ণনা করা হয়। তার মাতার নাম ছিল সওদা বিনতে সা'লাবা। হযরত যায়েদ ইয়ামেনের

এক অতি সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু কুযাআর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত যায়েদ যখন স্বল্প বয়স্ক ছিলেন তখন তার মাতা তাকে নিয়ে নিজ পিতার বাড়িতে যান। সেই স্থান দিয়ে বনু কায়েনের কিছু লোক যাচ্ছিল। সফরের সময় যখন তারা যাত্রাবিরতি দেয় তখন তাবুর সামনে থেকে তারা হযরত যায়েদকে, যিনি তখনও শিশু ছিলেন, তুলে নেয় এবং গোলাম বা দাস বানিয়ে উকাযের বাজারে হাকীম বিন হিযামের কাছে চারশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। হাকীম বিন হিযাম তার ফুফু হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদের কাছে হযরত যায়েদকে উপস্থাপন করেন আর এরপর হযরত খাদীজা (রা.) তার অন্য সকল দাসের সাথে হযরত যায়েদকেও মহানবী (সা.)-এর কাছে অর্পন করেন। এক বর্ণনানুসারে, হযরত যায়েদকে যখন ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে আসা হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর। হযরত যায়েদের নিরুদ্দেশ হওয়ায় তার পিতা হারেসা খুবই ব্যথিত ও দুঃখভারাক্রান্ত হন। কিছুকাল পর বনু কালবের কতিপয় ব্যক্তি হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় আসলে তারা হযরত যায়েদকে চিনতে পারে। হযরত যায়েদ তাদেরকে বলেন, আমার পরিবারকে আমার ব্যাপারে অবহিত করো যে, আমি কাবা গৃহের নিকটস্থ বনু মাআদের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে থাকি, তাই আপনারা কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। বনু কালবের লোকেরা ফিরে গিয়ে তার পিতাকে অবগত করে। এতে তার পিতা বলেন, কা'বার প্রভুর কসম! সে কি আমারই পুত্র ছিল? লোকেরা তার দৈহিক আকার-আকৃতি এবং বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। তখন তার পিতা হারেসা এবং চাচা কা'ব মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মক্কায় মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মুক্তিপণের বিনিময়ে তার সন্তান যায়েদের মুক্তির আবেদন জানান। মহানবী (সা.) যায়েদকে ডেকে তার মতামত জানতে চান। এতে হযরত যায়েদ তার পিতা এবং চাচার সাথে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে প্রদান করেছেন যে, হযরত খাদীজা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-কে বিয়ে করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, আমি সম্পদশালী আর তিনি হলেন দরিদ্র। তাঁর (সা.) কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমার কাছ থেকে চাইতে হবে, আর এটি হয়তো তিনি (সা.) সহ্য করতে পারবেন না, এমন পরিস্থিতিতে জীবন কীভাবে অতিবাহিত হবে। হযরত খাদীজা (রা.) অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এক নারী ছিলেন। তিনি খুবই বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন, তাই তিনি ভাবলেন, সমস্ত ধনসম্পদ যদি তাঁর (সা.) চরণে উৎসর্গ করে দেই তাহলে মহানবী (সা.)-এর মনে এই কষ্টকর অনুভূতি থাকবে না যে, এগুলো আমার স্ত্রী আমাকে দিয়েছে, বরং তিনি যেভাবে চাইবেন খরচ করতে পারবেন। সুতরাং বিয়ের মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই হযরত খাদীজা (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, আমি একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করতে চাই, আপনি যদি এর অনুমতি দেন তাহলে উপস্থাপন করব। তিনি (সা.) বলেন, কী প্রস্তাব? হযরত খাদীজা (রা.) বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার সমস্ত ধনসম্পদ এবং সকল কৃতদাস আপনার সেবায় উপস্থাপন করব আর এ সবকিছুই আপনার সম্পদ হয়ে যাবে। আপনি যদি গ্রহণ করেন তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হব এবং এটি আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের কারণ হবে। এই প্রস্তাব শোনার পর তিনি (সা.) বলেন, খাদীজা! তুমি কি চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছো? তুমি যদি সমস্ত সম্পদ আমাকে দিয়ে দাও তাহলে সেই সম্পদ আমার হয়ে যাবে, তোমার আর থাকবে না। হযরত খাদীজা (রা.) নিবেদন করেন, আমি ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর আমি উপলব্ধি করেছি যে, সুখেশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করার এটিই উত্তম পদ্ধতি। তিনি (সা.) বলেন, পুনরায়

চিন্তা করে দেখ, হযরত খাদীজা (রা.) নিবেদন করেন, হ্যাঁ, আমি খুব ভালোভাবে চিন্তা করেই বলছি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যদি চিন্তা করেই কথা বলে থাক আর সমস্ত ধনসম্পদ এবং সকল কৃতদাস আমাকে দান করে থাক, তাহলে এটি আমি পছন্দ করব না যে, আমার মতো অন্য কোন মানুষ আমার কৃতদাস বলে সম্বোধিত হবে। আমি সবার আগে কৃতদাসদেরকে মুক্ত করে দিব। হযরত খাদীজা (রা.) নিবেদন করেন, এখন এগুলো আপনার সম্পদ, আপনি যেভাবে চান এর ব্যবহার করতে পারেন। এটি শুনে তিনি (সা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি (সা.) বাহিরে বের হয়ে কাবা প্রাঙ্গণে আসেন আর এই ঘোষণা দেন যে, খাদীজা (রা.) তার সমস্ত ধনসম্পদ এবং তার সব কৃতদাস আমার হাতে তুলে দিয়েছে। আমি এই সকল কৃতদাসকে মুক্ত বা স্বাধীন করে দিচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, বর্তমানে যদি কারো ধনসম্পদ হস্তগত হয় তাহলে সে বলবে যে, চলো গাড়ি কিনে নেই, বাড়ি বানিয়ে নেই, ইউরোপ ভ্রমণ করে আসি। আর আজকাল এটিও দেখা গেছে, কোন কোন বিষয় আমার সামনেও আসে যে, স্ত্রী তার স্বামীর হাতে সম্পদ তুলে দিলে (স্বামী) নিজ কামনা-বাসনা তো পূর্ণ করেই অধিকন্তু স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার দিতেও অস্বীকার করে; এরপর স্ত্রীর আর কোন উপায় থাকে না। স্বামী ভাবে যে, সম্পদ যেহেতু আমার হস্তগত হয়ে গেছে তাই এখন সে আমার দাসী। কিন্তু মহানবী (সা.) এর যে মর্যাদা ছিল এবং যেই চিন্তাভাবনা ছিল, তা হলো- ধর্মের খাতিরে সম্পদ খরচ হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সম্পদ খরচ হওয়া উচিত, আর মানুষকে যে কৃতদাস বানানো হয় -এর যেন অবসান ঘটে। যাহোক, মহানবী (সা.) এর হৃদয়ে যে বাসনার উদয় হয়েছিল, তা হলো- যারা আমারই মতো খোদা তা'লার বান্দা আর বিবেক বুদ্ধি রাখে তারা কৃতদাস হয়ে কেন জীবন অতিবাহিত করবে। শুধু আরবের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এক আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল, কিন্তু তিনি এই বিস্ময়কর বিষয়েরই ঘোষণা প্রদান করেন। আর এভাবে ধনসম্পদ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও অসাধারণ উদারতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। রসূলে করীম (সা.) যখন এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, আমি সকল কৃতদাসকে মুক্ত করছি, তখন অন্য সব কৃতদাস চলে যায়, শুধুমাত্র হযরত যায়েদ বিন হারসা (রা.), যিনি পরবর্তীতে তাঁর (সা.) পুত্র হিসেবে পরিচিত হন, মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি তো আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু আমি মুক্তি চাই না, আমি আপনার কাছেই থাকব। তিনি (সা.) বলেন, স্বদেশে ফিরে যাও আর নিজের আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ কর, এখন তুমি স্বাধীন। কিন্তু হযরত যায়েদ (রা.) নিবেদন করেন, যে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা আমি আপনার মাঝে প্রত্যক্ষ করেছি এ কারণে আপনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। হযরত যায়েদ এক সম্পদশালী বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, কিন্তু ছোট বয়সেই ডাকাতদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং আরেকজনের হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এভাবে পর্যায়ক্রমে হাত বদল হতে হতে তিনি হযরত খাদীজার কাছে এসে পড়েন। এতে তার পিতা এবং চাচা গভীর চিন্তায় পড়ে যান আর তার সন্ধানে বের হন। তারা প্রথমে জানতে পারেন যে, যায়েদ রোমে আছেন। সেখানে গেলে জানতে পারেন যে, তিনি আরবে রয়েছেন। আরবে এসে জানতে পারেন যে, তিনি মক্কায় আছেন। মক্কায় আসার পর জানতে পারেন যে, তিনি রসূলে করীম (সা.) এর কাছে রয়েছেন। তারা তাঁর (সা.) কাছে আসেন এবং বলেন, আমরা আপনার ভদ্রতা এবং উদারতার খবর শুনে আপনার কাছে এসেছি। আপনার কাছে আমাদের ছেলে দাস হিসেবে আছে। তার মূল্য আপনি যা-ই চাইবেন, আমরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, আপনি তাকে মুক্তি দিন। তার মা

বৃদ্ধা এবং সে সন্তানের বিচ্ছেদের বেদনায় কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছে। আপনার বড় অনুগ্রহ হবে, যদি আপনি কাঙ্ক্ষিত মূল্য নিয়ে তাকে স্বাধীন করে দেন। রসূলে করীম (সা.) বলেন, আপনার ছেলে আমার দাস নয়। আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। এরপর তিনি (সা.) যায়েদকে ডেকে বলেন, তোমার পিতা এবং চাচা তোমাকে নিতে এসেছেন, তোমার মা বৃদ্ধা আর কেঁদে কেঁদে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি তোমাকে পূর্বেই স্বাধীন করে দিয়েছি, তুমি আমার দাস নও, তুমি তাদের সাথে যেতে পারো। হযরত যায়েদ উত্তরে বলেন, আপনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন ঠিক-ই কিন্তু আমি তো স্বাধীন হতে চাই না, আমি তো নিজেকে আপনার দাস-ই মনে করি। তিনি (সা.) পুনরায় বলেন, তোমার মায়ের অনেক কষ্ট আর দেখ তোমার পিতা এবং চাচা কত দূর থেকে আর কত কষ্ট করে তোমকে নিতে এসেছেন, তুমি তাদের সাথে চলে যাও। যায়েদের বাবা এবং চাচাও অনেক বুঝালেন কিন্তু যায়েদ তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আপনারা নিঃসন্দেহে আমার বাবা এবং চাচা আর আপনারা আমাকে অনেক ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁর (সা.) সাথে আমার যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা এখন আর ছিন্ন হতে পারে না। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমার মা খুব কষ্টে আছে -একথা শুনে আমিও অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে পৃথক হয়ে আমি জীবিত থাকতে পারবো না। অর্থাৎ মহানবী (সা.) থেকে বিচ্ছিন্ন হলে আমি বাঁচবো না। মায়ের দুঃখও এক দিকে রয়েছে কিন্তু এই দুঃখ আমার কাছে তার চেয়েও অধিক হবে। যায়েদের এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) কা'বা গৃহে গিয়ে ঘোষণা করেন, যায়েদ যে ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছে, এ কারণে আজ থেকে সে আমার পুত্র। এ কথা শুনে যায়েদের বাবা ও চাচা উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সানন্দে ফিরে যান কেননা তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে, যায়েদ খুব সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছেন। মোটকথা মুহাম্মদ (সা.)-এর অত্যুচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর প্রমাণ হলো, যায়েদ যখন বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন তখন মহানবী (সা.)ও অসাধারণ কৃতজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখেন।

সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, যখন তার বাবা এবং চাচা তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসেন তখন মহানবী (সা.) যায়েদকে বলেন, আমার পক্ষ থেকে পুরো অনুমতি রয়েছে। যায়েদ উত্তর দিলেন যে, আমি আপনাকে ছেড়ে কখনোই যাবো না। আপনি আমার জন্য আমার বাবা-চাচার চেয়ে বেশি কিছু। এখানে একটি নতুন তথ্য যোগ করা হয়েছে অর্থাৎ তখন যায়েদের পিতা রাগ করে বলেন, আচ্ছা, তুমি দাসত্বকে স্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছ? আমরা তোমাকে মুক্ত করতে এসেছি, নিয়ে যেতে এসেছি আর তুমি বলছ যে, আমি দাস হয়ে থাকবো! যায়েদ বলেন, হ্যাঁ, কেননা আমি তাঁর (সা.) মাঝে এমন গুণাবলী দেখেছি যে, আমি এখন আর কাউকে তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না।

মহানবী (সা.) যায়েদের এই উত্তর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান আর যায়েদকে কাবা প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন, হে লোকসকল! সাক্ষী থাকো, আজ থেকে আমি যায়েদকে মুক্ত করে দিচ্ছি আর তাকে নিজের পুত্র বানিয়ে নিচ্ছি, যদিও তিনি পূর্বেই স্বাধীন ছিলেন কিন্তু সেখানে জনসম্মুখেও তিনি (সা.) ঘোষণা করেন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। তিনি (সা.) যখন এই ঘোষণা করেন, সেই দিন থেকে হযরত যায়েদ'কে যায়েদ বিন হারেসার পরিবর্তে যায়েদ বিন মুহাম্মদ আখ্যায়িত হন। কিন্তু হিজরতের পর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যখন এই শিক্ষা

অবতীর্ণ হলো যে, পালক পুত্রকে নিজের পুত্র পরিচয়ে ঘোষণা বৈধ নয়। তখন যায়েদকে পুনরায় যায়েদ বিন হারেসা নামে ডাকা আরম্ভ হয়, কিন্তু এই বিশ্বস্ত সেবকের সাথে মহানবী (সা.)-এর ব্যবহার এবং ভালোবাসা তা-ই অব্যাহত থাকে যা প্রথম দিন ছিল বরং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেতে করতে থাকে, আর যায়েদের মৃত্যুর পর যায়েদের পুত্র ওসামা বিন যায়েদের সাথেও, যিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর খাদেমা উম্মে আয়মানের গর্ভজাত ছিলেন, তাঁর (সা.) সেই একই ব্যবহার এবং একই ভালোবাসা ছিল।

যায়েদের বৈশিষ্টাবলীর মাঝে একটি হলো, সকল সাহাবীর মাঝে কেবল তাঁর নামই পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যায়েদের বড় ভাই হযরত জাবালা বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সেবায় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, আমার ভাইকে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। সম্ভবত পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার এ ঘটনা ঘটে থাকবে। মহানবী (সা.) বলেন, এই তোমার ভাই তোমার সামনে আছে, সে যদি যেতে চায় তাহলে আমি তাকে আটকাবো না। তখন হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আপনার ওপর কখনো কাউকে প্রাধান্য দিব না। হযরত জাবালা বলেন, আমি দেখলাম আমার ভাইয়ের সিদ্ধান্ত আমার সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম ছিল। তার (রা.) ভাইয়ের পক্ষ থেকে আরও একটি রেওয়ায়েতও দেখা যায়। হযরত জাবালা বয়সে হযরত যায়েদের চেয়ে বড় ছিলেন, তার কাছে একবার জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনাদের উভয়ের মাঝে কে বড়, আপনি নাকি যায়েদ? তখন তিনি বলেন, যায়েদ আমার চেয়ে বড়, অবশ্য আমার জন্ম তার পূর্বেই হয়েছিল। তার কথার অর্থ ছিল, হযরত যায়েদ ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তার চেয়ে উত্তম।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রাজিআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা মহানবী (সা.) এর মুক্ত কৃতদাস যায়েদ বিন হারেসা'কে পবিত্র কুরআনের আয়াত ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (সূরা আল্ আহযাব: ০৬) অর্থাৎ সেই পালকপুত্রদেরকে তাদের পিতৃ (পরিচয়ে) ডাকা উচিত, এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সঙ্গত বিষয়; অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকতাম। হযরত বারা' (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত যায়েদকে বলেন, **'আনতা আখূনা ওয়া মওলানা'** অর্থাৎ, তুমি আমাদের ভাই এবং আমাদের বন্ধু। আরেকটি বর্ণনায় এই বাক্যও পাওয়া যায় যে, **'ইয়া যায়েদু আনতা মওলায়া ওয়া মিন্নী ওয়া ইলাইয়্যা ওয়া আহাব্বুন নাসে ইলাইয়্যা'** অর্থাৎ 'হে যায়েদ! তুমি আমার বন্ধু আর আমা হতে এবং আমার পক্ষ হতে আর তুমি আমার কাছে সকলের চেয়ে বেশি প্রিয়।'

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) হযরত উসামা বিন যায়েদের জন্য আমার চেয়ে বেশি ওযিফা বা ভাতা নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ হযরত উমরের পুত্র বর্ণনা করেন যে, যায়েদ (রা.)'র পুত্র উসামার ভাতা যখন ধার্য করা হয় তখন তা আমার চেয়ে বেশি ছিল। তখন আমি জিজ্ঞেস করি যে, কেন বেশি ধার্য করা হলো? তিনি বলেন, উসামা মহানবী (সা.)-এর কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল, অর্থাৎ যায়েদের পুত্র উসামা তোমার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে বেশি প্রিয় ছিল আর তার পিতা অর্থাৎ হযরত যায়েদ তোমার পিতার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন। হযরত উমর (রা.) নিজের সম্পর্কে বলছেন যে, আমার চেয়ে হযরত যায়েদ রসূলে করীম (সা.)-এর বেশি প্রিয় ছিলেন।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসা পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন আর নামায পড়েছেন। একথা

বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সকল শ্রেণীর মানুষ দান করেছিলেন। উসমান, তালহা এবং যুবায়ের মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। কেউ যদি বলত যে, সাধারণ মানুষ তাঁর সাথে রয়েছে, উঁচু শ্রেণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তিই তাঁকে গ্রহণ করে নি তাহলে এর উত্তর দেওয়ার জন্য উসমান, তালহা এবং যুবায়ের প্রস্তুত ছিলেন যে, আমরা সম্ভ্রান্ত বংশীয়। আর কেউ যদি বলত যে, কয়েকজন ধণাঢ্যকে নিজের পাশে ভিড়িয়েছে কিন্তু পৃথিবীতে যাদের আধিক্য সেই দরিদ্ররা তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করে নি; তাহলে যায়েদ, বেলাল প্রমূখ এই আপত্তির উত্তর দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। আর যদি কেউ বলত যে, এটি যুবক বা তরুণদের খেলা; তরুণরা (তাঁর সাথে) সমবেত হয়েছে তাহলে মানুষ তাদের এই উত্তর দিতে পারতো যে, আবু বকর (রা.) তরুণ বা যুবক আর অনভিজ্ঞ নন, তিনি কিসের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করেছেন। মোটকথা, তারা যে আঙ্গিকেই যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করুক না কেন, মহানবী (সা.)-এর সাথীদের মধ্য হতে প্রত্যেক ব্যক্তি সেসব যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এক জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে দণ্ডায়মান ছিল। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় একটি কৃপা ছিল যা মহানবীর ওপর হয়েছে। এরই উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (সূরা আল্ ইনশিরাহ্: ৩-৪) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)! বিশ্ববাসী কি দেখে না যে, যেসব উপকরণের মাধ্যমে কেউ জয় লাভ করে সেসব উপকরণ আমরা তোমার জন্য সরবরাহ করেছি। বিশ্ব যদি ত্যাগী যুবাদের দ্বারা জয়ী হয় তাহলে তারা তোমার কাছে রয়েছে। বিশ্ব যদি অভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠদের বুদ্ধিমত্তার অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের কারণে জয়যুক্ত হয় তাহলে তারাও তোমার কাছে আছে। বিশ্ব যদি সম্পদশালী ও প্রভাবশালী পরিবারের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে পরাজিত হয় তাহলে তারাও তোমার সাথে আছে। আর যদি সাধারণ জনতার কুরবানী ও নিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব জয়ী হয় তাহলে এই সমস্ত দাস তোমার অনুসরণে পাগলপারা। তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে, তুমি পরাজিত হবে আর এই মক্কাবাসীরা তোমার মোকাবিলায় জয়ী হবে। কাজেই وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ এর অর্থ হলো, সেই বোঝা যা তোমার কোমর ভেঙে দেয়ার উপক্রম করেছিল তা আমরা স্বয়ং বহন করছি। তুমি এই কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলে আমি এই কাজ কীভাবে করবো! খোদা একদিনেই তোমাকে পাঁচজন মন্ত্রী দান করেন। আবু বকর রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। খাদীজা রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। আলী রূপী খুঁটি তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। যায়েদ রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। ওরাকা বিন নওফেল রূপী স্তম্ভকে তিনি ইসলামের ছাদ নির্মাণের জন্য দণ্ডায়মান করে দিয়েছেন। এভাবে সেই বোঝা, যা তোমার একার ওপর ছিল, তা এরা সবাই বহন করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, চার ব্যক্তি, যারা তাঁর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেন অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী খাদীজা, তাঁর চাচাতো ভাই আলী, তাঁর মুক্ত কৃতদাস যায়েদ এবং তাঁর বন্ধু আবু বকর (রা.)। তাদের সবার ঈমানের পক্ষে দলীল তখন এটিই ছিল যে, তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। এরা সবাই ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে লিখেন,

মহানবী (সা.) যখন তাঁর মিশনের প্রচার আরম্ভ করেন তখন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)। তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি। হযরত খাদীজার পরে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ হযরত আবু বকর আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কাহাফার নাম উল্লেখ করেন, কেউ কেউ হযরত আলীর নাম বলেন যার বয়স তখন মাত্র দশ বছর ছিল, আর কেউ কেউ মহানবী (সা.)-এর মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার নাম বলেন। কিন্তু আমাদের মতে এই বিতর্ক অনর্থক। (কেননা) হযরত আলী এবং যায়েদ বিন হারেসা মহানবী (সা.)-এর ঘরের মানুষ ছিলেন আর তাঁর সন্তানদের মতো তাঁর সাথে থাকতেন। মহানবী (সা.) বলা মাত্রই তারা ঈমান আনে, বরং তাদের পক্ষ হতে সম্ভবত কোন মৌখিক স্বীকৃতিরও প্রয়োজন ছিল না। কাজেই এদের নাম উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। আর যারা বাকি ছিল তাদের সবার মধ্যে হযরত আবু বকর সর্বসম্মতভাবে অগ্রগামী এবং ঈমান আনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিলেন। অর্থাৎ বয়সের দিক থেকে বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান লোকদের একজন ছিলেন। ঐ যুগের শিশু-কিশোররাও মাশাআল্লাহ্ বুদ্ধিমান ছিল কিন্তু জগত যাদেরকে বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান বলে সেই নিরিখে হযরত আবু বকর (রা.) বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন যিনি পুরুষদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিলেন। যাহোক, তারা চারজন ছিলেন, তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা, যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেমনটি বলেছেন, তাদের অনেক বড় পদমর্যাদা রয়েছে।

তায়েফ সফরেও হযরত যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তায়েফ মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। খুবই সবুজ-শ্যামল এলাকা, যেখানে খুবই উন্নত মানের ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। সেখানে সকীফ গোত্রের লোকেরা বসবাস করতো। হযরত আবু তালেব এর মৃত্যুর পর কুরাইশরা মহানবী (সা.)-এর ওপর পুনরায় যুলুম-নির্যাতন আরম্ভ করলে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে সাথে নিয়ে তায়েফের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এটি দশম নববী সনের ঘটনা আর তখনও শাওয়াল মাসের কয়েকদিন বাকি ছিল। তিনি (সা.) দশদিন পর্যন্ত তায়েফে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি তায়েফের সকল রঈস বা নেতার কাছে যান, কিন্তু তাদের কেউ তাঁর বাণী গ্রহণ করে নি। তাদের যুবকরা তাঁর বাণী গ্রহণ করবে বলে যখন তাদের আশঙ্কা হয়, তাদের এই চিন্তা অবশ্যই হয়েছে যে, কোথাও যুবকরা বা সাধারণ লোকেরা ইসলামের বাণী গ্রহণ না করে বসে। তখন তারা বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও আর সেখানে গিয়ে বসবাস করো যেখানে তোমার বাণী গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর তারা ভবঘুরে লোকদের তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় আর তারা তাঁর ওপর পাথর ছুঁড়তে থাকে এমনকি একপর্যায়ে তাঁর দু'পা বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর ওপর নিক্ষিপ্ত পাথরগুলোকে নিজের শরীর দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করতে থাকেন যার ফলে হযরত যায়েদের মাথায়ও বেশ কিছু আঘাত লাগে।

হযরত যায়েদ (রা.) এর জীবনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী খুতবায় প্রদান করা হবে।